দৈনিক কালবেলা

বুধবার, ১৮ অক্টোবর ২০২৩, ৩ কার্তিক ১৪৩০

সা | ক্ষা | ৎ | কা | র

সংকট নিরসন

দেশের স্বার্থকেই প্রাধান্য দিতে হবে

১৯৭৩ থেকে '৭৫ সাল পর্যন্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করা **ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন** বর্তমানে ইষ্ট ওয়েষ্ট ইউনিভার্সিটির প্রধান উপদেষ্টা। এর আগে তিনি ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৮-২০০১ সালে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এবং নব্বইয়ের দশকে বিভিন্ন মেয়াদে সোনালী ব্যাংক, পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থার চেয়ারম্যান ছিলেন। বাংলাদেশের অর্থনীতির সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি নিয়ে কালবেলার সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **এম এম মুসা**

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

২০০৯ সাল-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি ভালো পারফরম্যান্স করেছে। করোনা-পরবর্তী সময়ে সারা পৃথিবীর মতো বাংলাদেশের অর্থনীতিও সংকটের মধ্যে পড়ে। কিন্তু দীর্ঘদিন পরও দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে পারছে না কেন?

করোনা-পরবর্তী সময়েও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি চলমান রয়েছে বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু সে সময়ে বাংলাদেশের জিডিপিতে মারাত্মক ধস হয়েছে, সেটা আগে জানা যায়নি। দেরিতে হলেও এটা আমরা জানতে পেরেছি। ২০১৯-২০ সালে বাংলাদেশের যে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে সেটি ধরে রাখার জন্য যা করা দরকার ছিল সেগুলো করা হয়নি। যেমন, শ্রমজীবীদের দক্ষতা ও অংশগ্রহণ বাড়াতে পারিনি, যেসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করলে উৎপাদন বাড়বে, সেসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে পারিনি। সব থেকে বড় বিষয় হলো—যেসব পণ্য দেশে উৎপাদন করা সম্ভব এবং উচিত সেগুলো আমরা আমদানি করছি। আমদানি করলে জিডিপির প্রবৃদ্ধি হবে না। সেটিই হয়েছে। আমদানি বেড়েছে বিপুল, যার চাপ সামলাতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে আমাদের।

অনেক দেশ পরিকল্পনা করেছিল তারা গাড়ি আমদানি না করে প্রথমে নিজ দেশে গাড়ি অ্যাসেম্বল করবে এবং পরে তারা নিজেরাই গাড়ি তৈরি করবে। তেমনি বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে দেশে গাড়ি অ্যাসেম্বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেই ধারাবাহিকতায় আমরা যদি দেশে গাড়ি তৈরি শুরু করতাম তাহলে আজ আমাদের গাড়ি আমদানি করতে হতো না।

বাংলাদেশে অর্থনীতির অগ্রগতি হয়েছে, জিডিপির প্রবৃদ্ধি ঘটেছে এবং সে সঙ্গে আয়বৈষম্য বেড়েছে—এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। একটা শ্রেণির হাতে বিপুল অর্থ জমা হয়েছে। তারা সেই অর্থে গাড়ি আমদানি করেছে, বিলাসবহুল ফার্নিচার আমদানি করেছে। তারা গৃহনির্মাণ সামগ্রী বিদেশ থেকে আনিয়েছে। অথচ এই সবকিছুই নিজ দেশে উৎপাদিত হওয়ার কথা ছিল। নীতিনির্ধারকদের অজান্তেই এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উদ্যোগে যে উৎপাদন কাঠামো তৈরি হয়েছে সেটা প্রবৃদ্ধির জন্য সহায়ক হয়নি। বিভিন্ন সমীক্ষায় আমরা দেখেছি বাংলাদেশে দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে। দেশে লেখাপড়ার মান কমেছে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের দেশে বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পড়াশোনা হচ্ছে না, যা খুবই উদ্বেগের। ফলে যতটা উৎপাদন হওয়া উচিত ছিল তার থেকে অনেক কম উৎপাদন হচ্ছে। উৎপাদন কম হওয়ার কারণে আমদানি হচ্ছে বেশি। ফলে প্রবৃদ্ধিও কম হচ্ছে।

জনসম্পদের মান উন্নত না হওয়ায় বিদেশ থেকে জনশক্তি আমদানি করতে হচ্ছে। আর এটি হিসাবের মধ্যে যে পরিমাণ দেখানো হচ্ছে, হিসাবের বাহিরে তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি। ফলে হুন্ডির মাধ্যমে অনেক অর্থ দেশের বাহিরে চলে যাচ্ছে। বাংলাদেশের কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে। তবে কৃষির প্রবৃদ্ধি জিডিপির প্রবৃদ্ধিতে খুব অল্পই ভূমিকা রাখে। এ ছাড়া আগের বছরগুলোতে জিডিপির প্রবৃদ্ধি এত বেশি এবং জিডিপি এত বড় হয়েছে যে, প্রাথমিক খাতের অবদান এখন মাত্র ১২ শতাংশ। ফলে প্রাথমিক খাতের প্রবৃদ্ধি চলমান থাকলেও সেটা মোট প্রবৃদ্ধিতে খুব একটা প্রভাব ফেলবে না।

> বাংলাদেশে অর্থনীতির অগ্রগতি হয়েছে, জিডিপির প্রবৃদ্ধি ঘটেছে এবং সে সঙ্গে আয়বৈষম্য বেড়েছে—এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। একটা শ্রেণির হাতে বিপুল অর্থ জমা হয়েছে। তারা সেই অর্থে গাড়ি আমদানি করেছে, বিলাসবহুল ফার্নিচার আমদানি করেছে। তারা গৃহনির্মাণ সামগ্রী বিদেশ থেকে আনিয়েছে। অথচ এই সবকিছুই নিজ দেশে উৎপাদিত হওয়ার কথা ছিল। নীতিনির্ধারকদের অজান্তেই এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উদ্যোগে যে উৎপাদন কাঠামো তৈরি হয়েছে সেটা প্রবৃদ্ধির জন্য সহায়ক হয়নি। বিভিন্ন সমীক্ষায় আমরা দেখেছি বাংলাদেশে দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে। দেশে লেখাপড়ার মান কমেছে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের দেশে বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পড়াশোনা হচ্ছে না, যা খুবই উদ্বেগের

বাংলাদেশের অর্থনীতির এখনকার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে উচ্চ মূল্যস্ফীতিকে বিবেচনা করা হচ্ছে। আমরা দেখেছি ভারত-শ্রীলঙ্কাসহ অনেকেই এটি নিয়ন্ত্রণে আনতে সমর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ কেন পারছে না?

এটি খুবই দুঃখজনক। পৃথিবীর সব দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ১ নম্বর লক্ষ্য থাকে দেশের মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা। মূল্য স্থিতিশীল রাখলে স্থানীয় মুদ্রার মান স্থিতিশীল থাকে। এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও সুদের হার নিয়ন্ত্রণে থাকে। সুদ হারের তারতম্যের মাধ্যমে মূল্যস্ফীতিকে কমানো হয়। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, ভারত এমনকি সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ শ্রীলঙ্কা। তারা সবাই এই নীতি অনুসরণ করেছে। শ্রীলঙ্কা এক বছরে মূল্যস্ফীতির হার ৬৯ শতাংশ থেকে ৩ শতাংশে নামিয়ে এনেছে। আমাদের নীতিনির্ধারকরা বারবার বলেছেন, সুদের হার বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। তাদের এই কথা একেবারেই হাস্যকর। সরকারের পরামর্শক যারা রয়েছেন তাদের এখনই মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। শুধু সুদের হার বৃদ্ধি করাই নয়, একই সঙ্গে ব্যাংকে আমানত নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্ন করাও উচিত নয়। যাতে দেশের মানুষের হাতে যে টাকা রয়েছে সেটা অন্য কোনোভাবে নষ্ট না হয়ে ব্যাংকের কাছে আসে।

এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে, আমানতের সুদের হার বাড়ালে ব্যাংক থেকে যে ঋণ দেওয়া হবে তারও সুদের হার বাড়াতে হতে পারে। তখন তো মূল্যস্ফীতি বাড়তে পারে। কিন্তু এটা যে ঘটে না তার অনেক উদাহরণ রয়েছে। যে সব প্রকল্প সবচেয়ে বেশি উৎপাদনশীল শুধু সেখানেই ঋণ যাবে। তারা উৎপাদন করবে এবং ব্যাংককে ঋণের টাকা আবার ফেরত দেবে। কিন্তু আমাদের দেশে একটি অদ্ভুত বিষয় লক্ষ করা যায়, যারা বেসরকারি ব্যাংকের মালিক তারাই আবার শিল্প উদ্যোক্তা। ব্যাংকে মুনাফা এত বেশি এবং দ্রুত আসে যে সবাই ব্যাংকে বিনিয়োগ করতে চায়। স্প্রেড যা দেখানো হয় বাস্তবে তার চেয়ে অনেক বেশি। ফলে ব্যাংকের পর ব্যাংক তৈরি হয়েছে। আমরা দেখেছি অর্থনীতির দুর্দিনেও ব্যাংকগুলো অনেক মুনাফা করছে। মূল্যস্ফীতির অন্যতম কারণ ব্যাংকগুলো। ব্যাংকগুলোর কার্টেলকে ভেঙে দিতে হবে।

দেশে পণ্যের বিরাট মজুদ রয়েছে অথচ দাম বেড়ে যাচ্ছে, এটা আশ্চর্যের বিষয়। সরকারের কর্তাব্যক্তিরা বলছেন সিন্ডিকেটে হাত দেওয়া যাবে না। এটা কেমন কথা! সিন্ডিকেট কিছু মানুষের সৃষ্টি, যারা আইন ভঙ্গ করছে এবং তারা একেবারেই ভীত। তাদের বিরুদ্ধে দুইভাবে ব্যবস্থা নেওয়া যায়। প্রথমত, সিন্ডিকেট ভেঙে দিতে হবে। কিন্তু সরকার সেদিকে যায়নি। সেক্ষেত্রে আমরা বলেছি, যেখানে পাঁচজনকে পণ্য আমদানির লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে সেখানে ৫০ জনকে দেওয়া হোক। তাহলে প্রতিযোগিতা হবে। আর প্রতিযোগিতা হলে তারা সিন্ডিকেট তৈরির সুযোগ পাবে না। দ্বিতীয়ত, সরকারি উদ্যোগগুলোকে বিস্ত আপ করতে হবে। টিসিবির মতো প্রতিষ্ঠানকে জোরদার করে সরকারের বড় আকারে নিজস্ব মজুত গড়ে তুলতে হবে। যেসব ব্যবসায়ীরা বাজার ম্যানুপুলেট করে, যারা সিন্ডিকেট করে তাদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে হবে যে, সরকারের কাছেও বিকল্প মজুত রয়েছে। '৯৮ সালে আমরা দেখেছি সরকার ১৫ লাখ টন ধান-চাল মজুত করে রেখেছিল। দেড় কোটি মানুষকে ৯ মাস ধরে তা খাওয়ানো হয়েছিল। তখন ধান-চালের দাম বাড়েনি। এ ছাড়া আরও একটি বিষয় আছে। সেটি হলো সমবায়। সরকার যে কোনো কারণে হোক এটিকে ভয় পায়। এ ধরনের কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে যারা সিন্ডিকেট করছে এবং যারা বাজার ম্যানুপুলেট করছে তারা লাগামছাড়া হয়ে গেছে। আগে বাজার তদারকি করার একটি ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সেই তদারকি করার ব্যবস্থা এখন আর নেই। এখন বাজার তদারকি হয় ক্যামেরার সামনে। অর্থাৎ ক্যামেরা যখন যায় তখন ক্যামেরার সামনে তদারকির ভাব দেখানো হয়। এরপর ক্যামেরা চলে গেলে আবার যা তাই।

⏭ এরপর পৃষ্ঠা ১০

প্রধান সম্পাদক : আবেদ খান

সম্পাদক ও প্রকাশক : সন্তোষ শর্মা

স্বত্ব © ২০২৩ কালবেলা মিডিয়া লিমিটেড

দৈনিক কালবেলা

বুধবার, ১৮ অক্টোবর ২০২৩, ৩ কার্তিক ১৪৩০

দেশের স্বার্থকেই প্রাধান্য দিতে হবে

বর্ষপূর্তি বিশেষ আয়োজন ⏭ ১২ পৃষ্ঠার পর

খুচরা বাজারে তদারকির চেয়ে পাইকারি বাজারে তদারকিটা বেশি প্রয়োজন। বিক্রেতাদের একটি বড় অস্ত্র হলো মোবাইল ফোন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তারা নিজেরাই ঠিক করে নেয় দাম কত হবে। আড়তদারের কোনো তদারকি নেই। অথচ তারাই আসল জায়গা। তারা আমদানি করে অথবা দেশের মধ্য থেকে পণ্য কিনে মজুত গড়ে তোলে। সেখানে যথাযথ তদারকি নিশ্চিত করা হলে এবং সরকারি একটি বাফার মজুত গড়ে তোলা হলে দেশে পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। আরও একটি ভয়ংকর সমস্যা হলো কৃষক বা যিনি উৎপাদন করেন তিনি ন্যায্যমূল্য পান না। নানাভাবে কৃষকশ্রেণিকে শোষণ করা হচ্ছে। প্রথমত তারা ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন না। দ্বিতীয়ত, তারা যখন কৃষি উপকরণ কিনতে যাচ্ছেন তখন অনেক বেশি দামে কিনতে হচ্ছে। তাই আমার কাছে মনে হয় উৎপাদন ও বিপণন সমন্বয় ছাড়া কৃষির বর্তমান সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। উৎপাদন ও বিপণন সমন্বয় করলেই কৃষকদের তিন বা চার শতাংশ সুদে মূলধন দেওয়া সম্ভব হবে। এখন ২১ লাখ টন পণ্য মজুত করার সক্ষমতাসম্পন্ন গুদাম রয়েছে দেশে। সেটিকে ৩০ বা ৩৫ লাখ টনে উন্নীত করতে হবে। কৃষক যেন নিজে তার উৎপাদিত পণ্য সেখানে রাখতে পারেন এবং নিজের সুবিধামতো সময়ে বাজারে তা ছাড়তে পারেন সে ব্যবস্থা করতে হবে। এতে কৃষকের শোষিত হওয়ার সুযোগ কমে যাবে। কৃষক উৎসাহজনক মূল্য পাবেন। আবার ভোক্তা পর্যায়ে কম দামে পণ্য পাবে। কৃষক এবং ভোক্তার মধ্যে মধ্যস্বত্বভোগীর দৌরাত্ম্য কমে যাবে। মূল্যস্ফীতি কমানোর নানা উপায় রয়েছে কিন্তু সরকার তার একটিও ব্যবহার করেনি। উল্টো আমাদের নীতিনির্ধারকরা বলছেন, এখানে হাত দিলে হাত পুড়ে যাবে। তারা আগুনে আরও ঘি ঢেলেছেন।

আমরা জানি বিশেষ করে চাল উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। তবুও আমরা দেখছি আমাদের চাল, আলু, মরিচ ও পেঁয়াজ আমদানি করতে হচ্ছে। এটা কেন করতে হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?

যারা সিন্ডিকেট করছে তাদের হাতে আমরা খেলছি। দেশে ডিমের চাহিদা দৈনিক সাড়ে তিন থেকে চার কোটি। কত ডিম আমদানি করবেন? এভাবে আমদানি করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া ডিমের উৎপাদন দেশেই হয়। আমদানি না করে দেশীয় উৎপাদনে প্রণোদনা দিয়ে দাম স্থিতিশীল করা দরকার। কৃষক আলু উৎপাদনের পর যে দামে বিক্রি করেন অফ সিজনে তার থেকে তিন গুণ-চার গুণ বেশি দামে সেই কৃষকই আবার সেটি কিনে খেতে হয়। কৃষক যে দামে বিক্রি করতে পারেন তার থেকে তিন-চার গুণ দামে ভোক্তাকে কিনে খেতে হয়। এসব ব্যাপারে বিস্তারিত গবেষণা করা দরকার। যারা এসব ব্যাপারে আগ্রহী যেমন, আমি একজনের নাম বলি, প্রফেসর আব্দুস সাত্তার মণ্ডল, তিনি এসব ব্যাপারে অনেক চিন্তাভাবনা এবং গবেষণা করেছেন। তার মতো আরও দু-চারজন ব্যক্তিকে নিয়ে যদি একটি প্রাইস কমিশন করা যায়, তাহলে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এ ধরনের প্রাইস কমিশন রয়েছে। সরকারের একেক জন একেক রকম কথা বলেন। যিনি যে ব্যাপারে অথরাইজড নন, তিনিও সে ব্যাপারে কথা বলেন। আর এ কারণেই বড় ধরনের সংশয় সৃষ্টি হয়। তাই যে যার মতো কথা না বলে জাতীয়ভাবে একটি প্রাইস কমিশন গঠন করে তাদের পরামর্শ নিয়ে সেই ভিত্তিতে যদি কাজ করা যায় তাহলে এই ধরনের সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব।

আমরা দেখেছি কৃষককে ব্যাংক ঋণ দিলে কৃষক সেই টাকা তারা ফেরত দেন। কিন্তু আমরা দেখছি শিল্পে এবং বড় ব্যবসায়ী গ্রুপগুলোকে ঋণ দেওয়া হচ্ছে, তা ফেরত আসছে না। অথচ ব্যাংকগুলো তাদেরই বেশি ঋণ দিতে উৎসাহী। এটা কেন ঘটছে?

সাধারণ অর্থে বললে, ব্যাংকে যারা ঋণ দেন, যেমন ম্যানেজার

বা অন্যান্য কর্মকর্তারা, তাদের সঙ্গে ব্যবসায়ী মহলের এক ধরনের সৌহার্দ্য থাকে। ব্যাংকের এই উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা এবং যারা বড় বড় ঋণ নিয়ে ঋণ খেলাপি হয়ে দেশের অর্থ বিদেশে পাচার করছে তারা একই শ্রেণির মানুষ। এই সমস্যার একটি বড় কারণ হলো নজরদারির অভাব। আমরা পাকিস্তানের একটি উদাহরণ দিই। আমরা প্রতিদিন বলি পাকিস্তান একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র, তাদের দেশে এই সমস্যা সেই সমস্যা। অথচ ওই পাকিস্তানই মানি লন্ডারিং প্রায় নির্মূল করে ফেলেছে। ফলে গত সেপ্টেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক বাজারে পাকিস্তানি রুপির দাম ৩০৬ টাকা থেকে ২৯০ টাকায় উন্নীত হয়েছে। তাদের মুদ্রার মান ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে তারা যদি পারে আমরা কেন পারব না? সরকারপ্রধানকে ভালোমতো অবহিত করলে এবং তিনি নীতি নির্ধারণ করে দিলে এই সংকটের সমাধান একেবারেই কঠিন নয়। শ্রীলঙ্কা থেকে আমাদের অর্থনীতি অনেক ভালো অবস্থানে রয়েছে। অথচ আমরা আমাদের নীতিনির্ধারণী সমস্যার কারণে অর্থনৈতিক সংকট তৈরি করছি এবং তার বৃদ্ধি করছি। আগামী ২০২৫ সাল থেকে বাংলাদেশকে বার্ষিক যে পরিমাণ বৈদেশিক ঋণের সুদ এবং ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে হবে তাতে আমরা আরও বড় ধরনের সমস্যায় পড়ব। এই সংকট মোকাবিলা করতে হলে আমাদের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন আরও বাড়াতে হবে, আমদানি কমাতে হবে এবং রপ্তানির বাজার সম্প্রসারণ করতে হবে।

দেশের মধ্যে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় যেসব খাতকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের মতো খাতকে আরও উৎসাহিত করতে হবে। এসব খাতে প্রশিক্ষণ দিয়ে অতি অল্প সুদে তাদের ঋণ দেওয়া যায়, সে ব্যাপারে বিসিককে ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা যদি ১০০ কোটি বা ২০০ কোটি টাকা ঋণ দিয়ে লাখ উদ্যোক্তা তৈরি করাই আমাদের আলটিমেট লক্ষ্য হওয়া উচিত।

সরকার বলছে খেলাপি ঋণ আদায় করতে গেলে প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাবে, কর্মসংস্থান বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী?

ঋণখেলাপিরা মূল উৎপাদনের সর্বোচ্চ ১৫-২০ শতাংশ উৎপাদন করছে। কিন্তু তাদের জন্যই বাকিরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তারা অবৈধ এবং অনৈতিক কাজ করছে অথচ তাদেরই সব ধরনের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এটা এক ধরনের সিন্ডিকেটের মতো। ঋণখেলাপিরা ছাড়া অন্য যারা রয়েছেন তারা খুব কষ্ট করে চালিয়ে যাচ্ছেন। ঋণখেলাপিদের আইনের আওতায় আনলে বাকিরা দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করবে। সুতরাং আমি এটা একেবারেই বিশ্বাস করি না যে—ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে কর্মসংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এটা একদমই খোঁড়া যুক্তি। এই যুক্তি যারা দিয়েছেন তারা সিন্ডিকেট বন্ধ করলে বাজার নষ্ট হয়ে যাবে টাইপের যুক্তি দিচ্ছেন।

অর্থনৈতিক সমস্যা এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করায় বেশিরভাগ ভূমিকা দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের। এগুলোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কি সঠিক রোল প্লে করতে পারছে বলে আপনি মনে করেন?

এখানে সবকিছুই শুধু বাংলাদেশ ব্যাংকের একক দায়িত্ব নয়। সরকারের বিভিন্ন এজেন্সির ও দায়িত্ব রয়েছে। ব্যাংক এবং এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠানগুলো মিনিস্ট্রির অধীনে। মানি লন্ডারিং যারা করছে সেটা খুঁজে বের করতে পারে সরকারের যে ৪-৫টি প্রতিষ্ঠান তার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি। সরকারের অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোকেও তো দায়িত্ব নিতে হবে। সুতরাং বাংলাদেশ ব্যাংকের দায় রয়েছে, কিন্তু সেটা একক দায় নয় বলে আমি মনে করি।

সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব কার সেই প্রশ্নে আমি বলব সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব হলো এনবিআরের। এনবিআর ইচ্ছে করলে একাই অনেক কিছু করতে পারে। আমার নিজের চোখে দেখা, আমদানি হওয়ার কথা ক্যাপিটাল গুডস সেখানে আমদানি হয়েছে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন ইলেকট্রিক যন্ত্র। অবৈধভাবে তারা এই পণ্য নিয়ে এসেছে এবং এর সরকারি ট্যাক্স অনেক বেশি। এনবিআর অফিসারের কাছে সেটা ধরা পড়েছে এবং সেই অফিসারকে বদলি করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এভাবে তো তারা কাজ করতে পারবে না। তাদের তো কাজ করার সুযোগ দিতে হবে এবং তাদের তো নির্ভয় দিতে হবে।

সাড়ে ৭ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি আমাদের দেশ এখন সাড়ে ৪০০ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। এটা তো এমনি এমনি হয়ে যায়নি। অনেক যোগ্য এবং সৎ ব্যক্তি ও অফিসার রয়েছে। তাদের সঠিক জায়গায় এনে কাজে লাগাতে হবে। তাদের কাজের স্বাধীনতা দিতে হবে।

দেশের বর্তমান মূল্যস্ফীতির পেছনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের টাকা ছাপানোর কোনো ভূমিকা কী?

মূল্যস্ফীতির সবচেয়ে বড় কারণ হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সরকারকে ঋণ দেওয়া। সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ব্যাপক পরিমাণ ঋণ নিয়েছে যার ফলে একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ের বাজার পর্যন্ত তার ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য নিত্যপণ্য ক্রয়ের ক্ষমতাও হ্রাস পেয়েছে। সুতরাং সরকারের উচিত কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ না নিয়ে যে কোনোভাবেই হোক এর বিকল্পগুলোকে ব্যবহার করা। সরকার পেনশন স্কিম থেকে টাকা সংগ্রহ করতে পারে, সঞ্চয়পত্র থেকে টাকা সংগ্রহ করতে পারে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকেও টাকা নিতে পারে; কিন্তু অবশ্যই টাকা ছাপানো বন্ধ করা উচিত। এখানে পেনশন স্কিম খুব ভালো একটি সমাধান। কল্যাণ রাষ্ট্রে এটা খুবই জরুরি। পেনশন স্কিম চালু করায় এখন থেকে কোনো ধরনের মূল্যস্ফীতি ছাড়াই সরকার খুব সহজে তহবিল সংগ্রহ করতে পারে এবং যাদের কল্যাণে হওয়ার কথা তারা কল্যাণপ্রসূ মধ্যে চলে যাবে। বাংলাদেশের পেনশন স্কিম চালু করা খুব ভালো একটি উদ্যোগ। কিন্তু এমন একটি সময়ে এটি চালু করা হয়েছে যখন দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ওপর মানুষের খুব একটা আস্থা নেই।

বর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে সরকারি কর্মকর্তারাই সবচেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছেন। এর বাইরে আছে টাকাওয়ালা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। তারা অনেকেই বিদেশে টাকা পাচার করছেন, দেশ লুণ্ঠন করছেন। আমরা বেগম পাড়ার কথা শুনি, সরকারের পক্ষ থেকে বারবার গর্জন শুনি আমরা বেগম পাড়ায় অমুক পাড়ায় রেড করব। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা বেশ উচ্চবাচ্য করছে। এই সময়টায় যদি সরকার তাদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে কাজ করে, সরকার যদি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চায় তাহলে এখন খুব সহজেই এসব বেগম পাড়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে। এমনকি পাচার হওয়া এসব টাকা ফেরত আনাও সম্ভব।

তারেক জিয়ার টাকা আমরা ফেরত নিয়ে আসছি একটা উদাহরণ তৈরি হয়েছে। এটাকে উদাহরণ ধরে আমরা অন্য পাচারকারীদের টাকাও ফেরত আনছি না কেন? আমি বারবার বলি—যারা সিস্টেমটাকে দুমড়ে মুচড়ে লাভবান হচ্ছে, উইন্ডফল করছে তাদের সংখ্যাটা খুবই নগণ্য। তাদের সংখ্যা শতকরা ৫-১০ ভাগের বেশি না। এই স্বল্পসংখ্যক অসৎ ব্যক্তিকে যদি নিয়ম-নীতির আওতায় আনা যায় তাহলে দেশের বাকি ৯০ ভাগ মানুষ অনেক খুশি হবে। তারা তখন দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করবে। আমি নিশ্চিত সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আমাদের অর্থনীতির এই সংকট সমাধান করতে তিন মাস সময় লাগবে এবং সেখান থেকে তরতর করে উপরের দিকে যেতে একদমই সময় লাগবে না।

বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকাকে কেমন দেখছেন?

জনগণই বলছে, অর্থ মন্ত্রণালয়কে আমরা খুঁজে পাই না। এটাতো মিথ্যা নয়। আগে অর্থ মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাজ অনেক দৃশ্যমান ছিল। অর্থমন্ত্রী এমনকি এই মন্ত্রণালয়ের সচিব অনেক দৃশ্যমান ছিলেন। এখন সেটা নেই। সরকারের কেউ কেউ বলেন—যারা বলে অর্থনীতির অবস্থা ভালো না তারা অশিক্ষিত। এটা ঠিক না। আমি অনেক খোঁজার চেষ্টা করেছি, অর্থনীতির বড় বড় পণ্ডিতরাও কখনো এ ধরনের কথা বলেন না। সরকারের জনবলের কোনো অভাব নেই। কিন্তু কে কাণ্ডারি হবেন, কার হাতে নিশান থাকবে, কি পলিসি গ্রহণ করবেন সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করারই অভাব দেখছি।

আমি ট্যাক্স-জিডিপির রেশিওর কথা অনেক বলেছি। দেশে প্রচুর টাকা রয়েছে। কিন্তু সরকারের টাকা ওঠানোর ক্ষেত্র নিয়ে রয়েছে সমালোচনা। এটা পলিসিগত সমস্যা। যেখানে আড়াই কোটি মানুষের আয়কর দেওয়া উচিত, সেখানে আয়কর দিচ্ছে মাত্র ৩০ লাখ লোক।

বর্তমানে বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে সেটা কি আমাদের অর্থনীতির ওপর প্রভাব ফেলবে?

আমি মনে করি দেশে যদি কোনো ধরনের সংঘাত হয় তবে এর পরবর্তী সময়ে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভয়াবহ হবে। এমনিতেই আমরা খুবই কঠিন রাস্তার মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছি। আর সেখানে যদি রাজনৈতিক সংকটের সমাধান না হয় তাহলে এই অর্থনৈতিক সংকটটি আরও প্রকট হবে। রাজনৈতিক সংকটের সমাধান করতে পারেন যে মধ্যমপন্থি ব্যক্তিবর্গ তাদেরও অমুক ঘরানার তমুক ঘরানার করে দেওয়া হচ্ছে। ফলে মধ্যস্থতা করার সুযোগ নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে। আর সেখানে যুক্ত হয়েছে বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর পাল্টাপাল্টি অবস্থান। আমরা এতদিন সবার সঙ্গে একটি ব্যালেন্স করে চলেছি। সামনেও আমাদের ব্যালেন্স করেই চলতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে দেশের স্বার্থকেই প্রাধান্য দিতে হবে।

প্রধান সম্পাদক : আবেদ খান
সম্পাদক ও প্রকাশক : সন্তোষ শর্মা
স্বত্ব © ২০২৩ কালবেলা মিডিয়া লিমিটেড